উপকূলে অনুকরণীয় সফল উদ্যোক্তা

ছোমেদ ফকির। উপকূলীয় অঞ্চলের একজন সফল মানুষ। চিংড়ির রেণু বিক্রির মাধ্যমে বরগুনার তালতলী উপজেলার ছোটা আমখোলা গ্রামে তার জীবিকা অর্জন শুরু। মেধা আর পরিশ্রমকে বিনিয়োগ করে নিজেকে গড়ে তোলেন সফল মানুষ হিসেবে। সিডর আইলার মতো শক্তিশালী ঝড়ও দমিয়ে রাখতে পারেনি তাকে। এসব মোকাবিলা করেই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন তিনি। তার সমন্বিত কৃষি প্রকল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে ত্রিশের অধিক মানুষ।

লেখাপড়া শিখে একদিন বড় মাপের মানুষ হবেন- ছোটবেলায় এমনই স্বপ্ন দেখতেন ছোমেদ ফকির। বাবা মারা যাওয়ায় অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় সে স্বপ্নের ইতি টানাতে হয় তাকে। ছোমেদ ফকির বাবার চার সংসারের মধ্যে দ্বিতীয় সংসারের ছয় ভাইবোনের মধ্যে বড়। বাবা মারা যাওয়ার পর বাবার প্রথম সংসারের সৎ ভাইয়েরা তার পড়ালেখার খরচ বন্ধ করে দেয়। সেই সঙ্গে বাবার জমিজমা থেকেও তাকে বঞ্চিত করে। এ অবস্থায় বাধ্য হয়েই সম্বলহীন ছোমেদ ফকিরকে নামতে হয় জীবিকার সন্ধানে। তিনি এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলেন কাজের সন্ধানে। কিন্তু কাজের লাগাম পাওয়া তো সহজ কথা নয়। তাছাড়া এত ছোট বয়সে কে তাকে কাজ দেবে। তবু হাল ছাড়েননি ছোমেদ। একটা কাজ জোগাড় না করতে পারলে পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে তাকে যে না খেয়ে মরতে হবে। জীবনযুদ্ধের এমনি সময়ে পরিচিত এক ব্যক্তির সহযোগিতায় ছোমেদ চিংড়ির রেণু সংগ্রহকারীদের কাছ থেকে রেণু কিনে খুলনায় বিক্রি করে যা আয় হতো তা দিয়ে অতিকষ্টে সংসার চালাতে থাকেন। চিংড়ির রেণু বিক্রির এক পর্যায়ে ছোমেদ ফকিরের সঙ্গে পরিচয় হয় খুলনার ঘের মালিক ওয়াজেদ আলীর। তিনি তার ঘেরে চিংড়ি মাছের রেণু বিক্রি করতে গিয়ে দেখেন ঘেরে চিংড়ি চাষের পাশাপাশি ওয়াজেদ আলী হাঁস পালন করছেন। ওয়াজেদ ছোমেদকে জানান, হাঁস পালন করে তার ভালোই আয় হয়। এতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকটি দেশি হাঁস কিনে পালন শুরু করেন। কাজটি করতে গিয়ে ছোমেদ আবারও সৎ ভাইদের রোষানলে পড়েন। তারা ছোমেদকে হাঁস পালতে বাধা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে ১৯৮৪ সালে এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেন। এরপর শ্বশুরের সহযোগিতায় তার সৎ ভাইদের কাছ থেকে পিতার রেখে যাওয়া জমিজমার মধ্য থেকে তার অংশের প্রাপ্য জমি উদ্ধার করেন।

শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। এরপর তিনি স্ত্রীর পরামর্শে ছোট একটি পুকুর খনন করে চিংড়ি পোণা চাষ শুরু করেন। এতে লাভবান হওয়ার পরে ৫ শতাংশ জমিতে পুকুর খনন করে চিংড়ির পোণা চাষ ও হাঁস পালন শুরু করেন। সেই সঙ্গে উদ্ধারকৃত পৈতৃক জমিতে শুরু করেন কৃষি কাজ। কিন্তু সব কাজ একসঙ্গে শুরু করতে গিয়ে ছোমেদ ফকির আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এক পর্যায়ে আর্থিক সাহায্যের জন্য তার স্ত্রী ফিরোজা বেগম স্থানীয় আরডিএফ নামে একটি

বেসরকারি সংস্থার সদস্য হন এবং দুই দফায় ৩ ও ৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এতে তার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় পরে ২০০৬ সালে সংগ্রাম নামে আরও একটি বেসরকারি সংস্থার সদস্য হন এবং সেখান থেকে প্রথম দফায় ৫ হাজার এবং দ্বিতীয় দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে কৃষি ও মৎস্য চাষে বিনিয়োগ করেন। এরই মাঝে ২০০৭ সালে সিডরে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ছোমেদ ফকিরের কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রকল্প। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ছোমেদ ফকির নিজে সংগ্রামের সদস্য হন এবং প্রথম দফায় ১৫ হাজার ও রেসকিউ (সিডরের কারণে পুনর্বাসন প্রকল্প) থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের এ টাকায় ছোমেদ ফকির নতুন উদ্যোমে মাছ, সূর্যমুখী, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসল ও সবজি চাষ শুরু করেন। এতে তিনি ওই বছর ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জণ করেন। এর পর তার আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

কৃষি ও মৎস্য প্রকল্পের আয় থেকে ছোমেদ ফকির নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই রেসকিউ ঋণ পরিশোধ করেন। এর পর পর্যায়ক্রমে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন করেন। পুকুরের পাড়ে ১০০টি নারকেল গাছ রোপণ করেন। ২০১৪ সালে ছোমেদ সংগ্রাম থেকে আড়াই লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের এ টাকা এবং জমানো টাকা দিয়ে কৃষি কাজের পাশাপাশি গলদা চিংড়ি, দেশি ও কার্প জাতীয় রুই, কাতল, সিলভার, তেলাপিয়া ও কৈ মাছের চাষ শুরু করেণ।

এসব প্রকল্পের লাভের টাকা দিয়ে মুদিদোকান দিয়েছেন। সাড়ে ৯ লাখ টাকা দিয়ে পর্যায়ক্রম দুই একর জমি কিনেছেন। কাঁচা ঘরকে আধাপাকা কাঠ দিয়ে দোতলা করেছেন। তার ইচ্ছা ছেলেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাবেন। বর্তমানে তার ছেলে বরগুনা সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ছে। ছোমেদ ফকিরের উৎপাদিত চিংড়ি বিভিন্ন এজেন্সির মাধমে বিদেশে রফতানি হয়ে থাকে। উৎপাদিত নারকেল ও সূর্যমুখী পাইকারি হিসেবে আশপাশের জেলায় বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

ছোমেদ ফকির জানান, তার এলাকায় লণাক্ত পানির কারণে মিঠা পানির মাছ চাষ অসম্ভব। কিন্তু তিনি নিজস্ব মেধা দিয়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে এবং ওই পানিতে মিঠা পানির দেশি কৈ, শিং, পাবদা মাছ চাষ করছেন। তাছাড়া মিঠা পানি দিয়ে তিনি অন্যান্য সবজিও চাষ করে থাকেন। উপকূলীয় এলাকায় তার পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকেই তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে মাছ ও সূর্যমুখীসহ অন্যান্য ফসল চাষ করছে। এলাকায় তার সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই মধ্যে তার স্ত্রী স্থানীয় সরকারের সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। প্রত্যন্ত এলাকায় এ ধরনেরন প্রকল্প গড়ে ওঠা অসম্ভব: কিন্তু ছোমেদ ফকির তা করে অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ছোমেদ ফকির এ বছর নবম সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরষ্কার শ্রেষ্ঠ কৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিভিাগে প্রথম হয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা পুরষ্কার পেয়েছেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিটি ফাউন্ডেশন এ পুরষ্কার দিয়ে আসছে। এতে সহায়তা দিচ্ছে সিটি ব্যাংক এনএ এবং ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপামেন্ট ফোরাম। আয়োজকরা জানান, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদানে উৎসাহিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

সূত্রঃ uddyog-bd.com